কান্দাহারের পথে

মূল
জেসন বার্ক

রূপান্তর
তাসনীম বিনতে কাশেম

প্রজন্ম
মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
www.projonmo.pub

কান্দাহারের পথে

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০২১
প্রচ্ছদ : ওয়াহিদ তুষার

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com/projonmo

amaderboi.com/projonmo

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; তানভীর প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

Kandaharer Pothe by Jason Burke
Transformed by Tasnim Binte Kashem
Published by Projonmo Publication
Copyright © Projonmo Publication
ISBN : 978-984-95578-8-3

সূচিপত্র

- আমি যখন কিশোর গেরিলা ৫
- মাজার এবং আগুন ২২
- আফগানের গ্রীষ্ম ৩৭
- আফগান শরৎ ৫০
- বাইতুল হিকমাহ : প্রজ্ঞাঘর ৬২
- প্রথম ছেলেটা গুলি খেয়েছিল বেলা তিনটার দিকে ৭৬
- হিন্দুকুশের সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ ৯৪
- আফগানি শীত ১০৪
- শেষ পরিণতি ১১২
- কুর্দিস্তানে ফিরে যাওয়া ১২২
- রহস্য ও মিথ্যা ১৩৪
- ঐন্দ্রজালিক দুর্দশার সফর ১৪৮
- ছত্রভঙ্গ ১৬২
- মিস সিক্সটি ১৭৬
- ভারকেন্দ্র ১৯১
- Conclusion : London & Pakistan ২০৯

আমি যখন কিশোর গেরিলা

চিঠিটা একটা ব্যাগের নিচে চাপা দিয়ে রেখেছিলাম। পরদিন সকালে লোকাল বাসে করে যাত্রা শুরু করলাম পশ্চিমদিকে। একদম বাজে একটা রাস্তা। রাস্তাটা চলে গেছে উঁচু উঁচু সব পাহাড়ের দিকে। পাহাড়গুলোর ঢাল ধূসর শিলায় ভাঙা পাইনে একদম ভর্তি হয়ে আছে।

ছায়াঢাকা নোংরা বরফের তীরভূমি আর সন্ধ্যার সাথে নেমে আসা শীতলতায় এটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, বছরের শুরুতে পালানোর সময় কেন এত এত শরণার্থী পাহাড়ে মারা পড়েছিল। গভীর গিরিখাতের প্রান্তে একটি গ্রামে রাতের জন্য থামলাম আমরা। রাত কাটালাম রাস্তার ধারে একটি হোস্টেলে। শুতে হয়েছিল মেঝেতেই। রাতে বেশ কয়েকবার জেগে উঠতে হল গানফায়ারের শব্দে।

সকালে গরম রুটির সাথে পাতলা দই আর ছোট গ্লাসে করে চা খেলাম। তামাটে রঙের চা। নিরাসক্ত গ্রামবাসীদের দেখছিলাম, ভারী অস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যদেরকে মাঠের মধ্য দিয়ে পথ দেখিয়ে উঁচু পাহাড়ের দিকে নিয়ে চলেছে। আমাদের বলা হয়েছিল সেখানে গেরিলাদের বিরুদ্ধে বিশাল অপারেশন চলছে।

বিকালের দিকে আমরা সোজা রাস্তা ধরে পাহাড় থেকে সমতলের দিকে নেমে এলাম। সীমান্তবর্তী শহরের বাইরে মরুভূমিতে একটা রিফিউজি ক্যাম্প ছিল। ক্যাম্পের হাজারখানেক পরিবার নির্ভর করত জাতিসংঘের সহায়তার ওপর। আমাদের বলা হয়েছিল চিঠিটা সেখানেরই একজনকে দিতে। লোকটাকে খুঁজে পেলাম আমরা। চিঠিটা পড়ে সে আমাদের জানাল যে, বর্ডার পাড়ি দেওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো সোজা একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসা। মাত্র ১০ ডলার খরচ হবে এতে, আর সময়ও লাগবে ১ ঘন্টার কম। খুব হতাশ হলাম আমরা।

অনেক সময় মাতাল অবস্থায় বা কাউকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার ভূত চাপলে লোকদের বলে বেড়াতাম যে, আমি আমার কৈশোরে একজন গেরিলা হিসেবে যুদ্ধ করেছিলাম। কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়। আমার বয়স ছিল ২১ এবং যদিও আমি অস্ত্র বহন করতাম, কিন্তু যুদ্ধ করিনি। আসল ঘটনা হলো, কখনো গোলাগুলি শুরু হলে আমি পরিখায় গিয়ে লুকিয়ে পড়তাম।

১৯৯১-এর গ্রীষ্মকাল। কয়েক মাস আগেই কুয়েত আর কুয়েতের তেল দখল করার মতো সাদ্দাম হোসেনের ভুল পদক্ষেপ আমেরিকার নেতৃত্বাধীন সামরিক জোটের হাতে বানচাল হয়ে যায় খুব অল্প সময়েই। যুদ্ধপরবর্তী অবস্থায় উত্তরের কুর্দিদের অনুসরণে দক্ষিণ ইরাকের শিয়ারাও বিদ্রোহ করে বসে।

দুপক্ষই বিশ্বাস করে বসেছিল যে তারা তাদের মিত্রদের থেকে সহায়তা পাবে, কিন্তু মিত্রদের সহায়তা তারা তখনই পেয়েছিল যতক্ষণ না সাদ্দামের ট্যাংক ও হেলিকপ্টার এসে না পড়ে। এগুলো চলে আসার পর প্রথমে শিয়াদেরকে আক্রমণ করা হলো এবং বেশ কয়েকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর কুর্দিদেরকে তাদের ঐতিহাসিক পাহাড়ি স্ট্রংহোল্ডের দিকে ঠেলে দেওয়া হলো। এর ফলে লক্ষাধিক উদ্বাস্তু ইরান ও তুর্কি সীমান্তের দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। অন্তত লাখখানেক মানুষ এতে মৃত্যুবরণ করল।

অন্যান্য আরও সেকেন্ড ইয়ার গ্রাজুয়েটদের ইউরোপে চক্কর দেওয়ার চেয়ে বন্ধু আইয়ানের সাথে আমার সফরটা খুব একটা আলাদা করে দেখার মতো কিছু ছিল না। ঝাঁকি খেতে খেতে তুর্কি ঘুরেছি দুজনে, প্রচুর পরিমাণ ইফেস বিয়ার খেয়েছি এবং ক্যাপাডোসিয়ার একটা সস্তা হোটেলে দুটো ড্যানিশ মেয়ের সাথেও কিছুটা সময় কাটিয়েছি।

কিন্তু যখন আমরা দেশটির পূর্বের ভেন শহরে পৌঁছাই, তখন আমাদের আধাছাঁদা পরিকল্পনাটা পুরোপুরি একটা রূপ নিতে শুরু করল। যদিও এটা নিয়ে আমরা প্রথমে কোনো কথা বলিনি, কিন্তু তারপরও আমরা জানতাম যে প্ল্যান একটা আমাদের আছে। আমরা বেশ সতর্কতার সাথে এমনসব লোকদের সাথে যোগাযোগ করতে শুরু করলাম, যাদেরকে আমাদের মনে হয়েছিল যে তারা আমাদেরকে পিকেকে'র সাথে দেখা করিয়ে দিতে পারবে। পিকেকে হচ্ছে স্থানীয় কুর্দি মার্ক্সিস্ট গেরিলাদের দল, যারা তখন পর্যন্ত সাত বছর ধরে দক্ষিণ-পূর্ব তুর্কির পাহাড়ি অঞ্চলে বিদ্রোহের সাথে জড়িয়ে ছিল।

আসলে তাদের সাথে দেখা করাটা ছিল খুবই বিপজ্জনক। ভেনের বাজারে একজন কার্পেট বিক্রেতা আমাদেরকে খুব ধীরে-স্থিরে বিশ্বাস করাতে চাচ্ছিল যে, এই দলটার পশ্চিমা ট্যুরিস্টদের জিম্মি করার অভ্যাস আছে। সে আমাদেরকে বিকল্প একটা উপায় বলে দেয়। সে জানায়, আমরা যেন ইরাকের মধ্য দিয়ে বর্ডার ক্রস করি। সেখানে উত্তরাঞ্চলে কুর্দিরা তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। কম-বেশি যাই হোক, এভাবেই যে আমাদের করতে হবে—সেটাই মনে মনে ছিল।

লোকটা আমাদের বলে দিল, আমাদেরকে ১০০ মাইল বা তার থেকে কিছুটা দূরের একটা শহর হাকারিতে যেতে। সেখানকার উমিত হোটেলে গিয়ে আখমেদের কথা জিজ্ঞেস করতে হবে এবং বলতে হবে—আমাদেরকে আপেল পাঠিয়েছে। আমরা বাসে উঠলাম, শহরের কেন্দ্র থেকে সামান্য দূরে হোটেল খুঁজে বের করে আখমেদকে আপেলের কথা বললাম।

এসব মেলোড্রামা আখমেদকে আমোদিত করলেও সে কিছু প্রকাশ করল না। ঘন্টাখানেকের মাঝে আমাদের হাতে থাকা সিল করা চিঠিটা একটা সেকেলে ধাঁচের হোটেল রুমে দুজন লোকের হাতে তুলে দেই। লোক দুটো একেবারে কম কথা

বলে। পুরোটা সময়ে তারা একবারও বসলো না, ওভারকোটটাও খুলে রাখলো না। স্কয়ারের বাইরে তুর্কি সেনারা ট্রাক থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে নামছিল আর দোকানপাট, ছাগল ও জীপে ভরা রাস্তায় গিয়ে জমায়েত হচ্ছিল সবাই। আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে পাহাড় পেরিয়ে নীচে নেমে আসি, তারপর সীমান্তের দিকে সমভূমিতে অবস্থিত রিফিউজি ক্যাম্পে পৌঁছে যাই। এই প্রথমবার, এর আগে কখনো রিফিউজি ক্যাম্পে আমার থাকা হয়নি।

দুপুরের দিকে সূর্য সোজা নিচের দিকে নেমে এল; ধূলিকণা তাঁবুর মাঝের ফাঁকা জায়গায় উড়ে বেড়াতে শুরু করল। নারী আর শিশুদের একটা দল পানির ট্যাংকারের চারপাশে বেশ কতগুলো আজীব কিসিমের পাত্র নিয়ে ধাক্কাধাক্কি করছিল। কিছু রিফিউজি তাদের বন্ধু-পরিবারের কাছে দেওয়ার জন্য চিঠি দিয়েছিল আমার কাছে। কারণ, সেখানে কোনো পোস্ট অফিস তো ছিলই না আর টেলিফোন করাটাও ছিল অনেক খরচাপাতির কাজ। কিন্তু তাড়াহুড়ায় সেগুলো আমি ট্যাক্সিতেই ফেলে আসি, যেটাতে করে আমরা ইরাকের কাছাকাছি সীমান্তে পৌঁছেছিলাম পরের দিন সকালে। আমি যখন বেশভূষা বদলানোর জন্য লেবুর রসে চুল ব্লন্ড করে ঝানু কমব্যাট হওয়ার কথা আইয়ানকে বললাম, সে আমাকে সোজা নিষেধ করে দিল।

পথিমধ্যে একটা আমেরিকান বেইস চোখে পড়ল, যেখানে লম্বা লাইনে ঝরঝরে পরিচ্ছন্ন সব যুদ্ধযান সাজিয়ে রাখা ছিল। বর্ডারে ছিল কুর্দিশ সেনারা, টহলরত। দাড়ি, ছককাটা পাগড়ি, ঐতিহ্যবাহী ঢোলা পায়জামা, চওড়া বেল্ট, স্কয়ার টিউনিক টপসে তাদের অসম্ভব রোমান্টিক লাগছিল। সাদ্দাম হোসেনের ছবিওয়ালা, গুলিতে ঝাঁঝরা একটা জীর্ণ ব্যানার ঝুলছিল, যা আমাদের জানান দিচ্ছিল যে, আমরা ইরাকি কুর্দিস্তানে প্রবেশ করেছি।

আমি বেশ জোর দিয়েই এটা বলব যে, অনেক দিন থেকেই কুর্দিদের প্রতি আমার বেশ অপ্রতিরোধ্য একটা আকর্ষণ ছিল আর আমি তাদের সংগ্রামের অংশ হতে চেয়েছিলাম। যাই হোক, সেটা আর আমি পারিনি। শেষপর্যন্ত আমি পেশমারগাদের সাথেই ভিড়ে গিয়েছিলাম।

চলে গিয়েছিলাম ইরাকে, কারণ আবার থাইল্যান্ডে ফিরে যাবার কোন ইচ্ছা ছিল না আমার অথবা চাইনি পুরোটা গ্রীষ্ম কাটিয়ে দেই কোনো সুপারমার্কেটের ওয়ারহাউজে কাজ করে করে, যেমনটা করেছিলাম গত বছর। ১৫ বছর বয়সে সাংবাদিক হবার বেশ একটা ইচ্ছা ছিল আমার। সাদা-কালো টিভিতে দেখা ইরাকের ওপর বিমান হামলা আর 'শত ঘন্টার যুদ্ধ' আমার সেই কিশোরকালে সাংবাদিক হওয়ার ইচ্ছাকে উস্কে দিয়েছিল।

বসন্তে ডন ম্যাককুলিনের বায়োগ্রাফি পড়েছি বারবার, যিনি ছিলেন একজন ব্রিটিশ ওয়ার ফটোগ্রাফার। তার সাদা-কালো ছবি এবং ব্যক্তিগত জীবনের টানাপোড়েন আমার কাছে সমানভাবে করুণ, রোমান্টিক, সহানুভূতিশীল ও কঠিন

মনে হয়েছিল। আমি প্রচুর ফিল্ম, দুটো খুব পুরাতন ক্যামেরা, একজোড়া লেন্স ও একটা নোটবুক কিনেছিলাম এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ইরাক যাওয়ার, যাতে করে আমার নামও সবখানে ছড়িয়ে পড়ে।

জুলাই মাসে আমি আর আইয়ান যখন সেখানে পৌঁছলাম, তখন দেশটির সামরিক অবস্থা প্রায় স্থিতিশীল। দেশের দক্ষিণে যুদ্ধ তখন বন্ধ অনেকদিন যাবত। উত্তরে পশ্চিমা সেনাদের যে বাহিনী ইরাক ভূখণ্ডের ভেতর একটা 'নিরাপদ আশ্রয়' পাহারা আর ইরাকের বিমান বা স্থল আক্রমণ প্রতিরোধে নিযুক্ত ছিল, তারাও তুর্কি ভূখণ্ডে ফিরে যাচ্ছিল। তাদের তাৎক্ষণিক কাজটা যতটা না সামরিক ছিল, তারচেয়ে বেশি ছিল মানবিক। কাজটা শেষও হয়ে গিয়েছিল। তুর্কিতে অবস্থিত একটা এয়ারক্রাফট ইরাকের উত্তর সীমান্তের পাহাড়ের পাদদেশ ও সমভূমিতে কুর্দিদের ভবিষ্যৎ ছিটমহলের জন্য প্রটেক্টিভ আমব্রেলা হিসেবে কাজ করছিল। এর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়ে গিয়েছিল যে, উপসাগরীয় যুদ্ধ কার্যকরভাবে শেষ হয়ে গেছে।

প্রকৃতপক্ষে মিত্রবাহিনীকে প্রত্যাহার করার কিছুদিন পূর্বেই আমি আর আইয়ান দেশে ফিরে গিয়েছিলাম। তখন একের পর এক এমনসব শক্ত কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল, যা কুর্দি-বাহিনী এবং ইরাকিদের মধ্যে বিগত সপ্তাহে সম্পাদিত অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি নস্যাতের হুমকিস্বরূপ ছিল। খুব কম খবরের কাগজ পড়া বা রেডিও শোনার কারণে আমরা এসবের কিছুই জানতাম না। সে হিসেবেই তুর্কি অভিমুখে আমরা যাত্রা করি।

আসলে কী ঘটেছিল তার সাথে নিজেদের যুক্ত রাখার প্রয়োজনীয়তা আমরা একরকম চিন্তাই করিনি।

আমরা উত্তর ইরাক, সেখানকার জনগণ, তাদের সংস্কৃতি বা সমাজ-ইতিহাসের মোটামুটি রূপরেখা ছাড়া প্রায় সব ব্যাপারেই একেবারে অজ্ঞ ছিলাম। বসন্তে শুধু কিছু খবরের কাগজ পড়া হয়েছিল এবং বিদ্রোহের প্রথম সপ্তাহে উত্তর ইরাক থেকে কুর্দিদের প্রস্থানের অল্পকিছু ছবি দেখেছিলাম। ইরাক বা প্রকৃতপক্ষে ইসলামি বিশ্ব সম্পর্কে সাধারণভাবে আমরা তেমন কিছুই জানতাম না। এই অঞ্চলের ট্র্যাডিশনাল ট্যুরিস্টদের মতো আমরাও ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম; কিন্তু এটা যে এত সমস্যা সৃষ্টি করবে তা আমাদের চিন্তায়ও ছিল না।

আমরা তুরস্কের সীমানা থেকে ত্রিশ মাইল দক্ষিণে দোহুকের বাইরের একটি পাহাড়ে গোলাগুলি করার প্রশিক্ষণ নিলাম। একটা রিফিউজি পরিবার তাদের অস্থায়ী খুপরি ঘর থেকে সন্ধ্যার আলোয় নিতান্ত আবেগশূন্য দৃষ্টিতে আমাদের দেখছিল। জেট আমাদের মাথার ওপর পরিষ্কার আকাশে বাষ্পজালের চিহ্ন রেখে চলে গেল, কিন্তু আমরা জানতে পারলাম না সেটা ইরাকি না মিত্রবাহিনীর বিমান। আমাদেরকে শেখানো হয়েছিল কীভাবে অটোমেটিক এবং সিংগেল শট করতে হয়, কীভাবে নিম্নমুখী অবস্থায় লক্ষ্য স্থির করতে হয় এবং শক্তভাবে নিষেধ করা হয়েছিল যেন

নিচের দিক থেকে বা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ফায়ার না করি। আমাদের দেখানো হয়েছিল কীভাবে ম্যাগাজিন সুইচ করতে হয়, স্টিফ বোল্টটি পেছনে টেনে চেম্বারের মধ্যে বৃত্তাকারে আনতে হয়, কীভাবে অস্ত্রের পার্ট আলাদা করতে হয়, পরিষ্কার করে নিয়ে আবার জোড়া লাগাতে হয়। সেশন শেষ হয়েছিল কিছু কুইক রিমাইন্ডার দিয়ে; মাইনের ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছিল। কুর্দিশ আর ইংরেজিতে অস্ত্রের পার্টগুলোর নাম বলা হয়েছিল এবং বৈচিত্র্যের খাতিরে জার্মান, টার্কিশ, ফারসি ও আরবিতেও বলা হয়েছিল।

খুব অল্প সময়ের জন্য আমি প্রায় ছয়টি ভাষায় 'সেইফটি ক্যাচ' এবং 'ফায়ারিং পিন' শব্দগুলো জানতে পারলাম। ইউনিটের নেতৃত্বে ছিলেন উত্তর ইরাকের দুটি প্রধান দলের মধ্যে বৃহৎ দল কুর্দি ডেমোক্রেটিক পার্টি বা কেডিপি'র নেতা মাসউদ বারজানির আত্মীয় ফিরইয়াদ বারজানি। স্থানীয় কেডিপি অফিসে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে নিজেদের জাহির করার আগের দিনই ত্রিশ বছর বয়সী ফিরইয়াদের সাথে আমাদের পরিচয় হয়।

কড়া ইস্ত্রি করা টিউনিক ও ট্রাউজার, ওপেন-নেক শার্ট, ঝরঝরে দ্রুত পদক্ষেপ এবং হিপ হোলস্টারে ঝোলানো হ্যান্ডগানে তাকে একজন স্বপ্রতিভ ব্যক্তি বলেই লাগছিল আমাদের। তিনি আমাদের ট্রেইনিং নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন; বিশেষ করে আমরা যখন টার্গেটে সঠিকভাবে হিট করতে পারছিলাম। সেদিন সন্ধ্যায় অস্থায়ী বেইস হিসেবে ব্যবহৃত পরিত্যক্ত স্কুল ঘরে আমরা যখন ডিনার করছিলাম, তখন ফিরইয়াদ আমাদের কুর্দি জাতীয় সংগীত শেখানোর চেষ্টা করছিলেন। শব্দগুলো একটি জাতীয়তাবাদী গেরিলা সেনাবাহিনীর শোভাযাত্রার গানের প্রায় প্যারোডি বলা চলে, যেগুলো গুরুত্ব সহকারে নেওয়াটা বেশ কঠিন ছিল।

জাতীয় সংগীতের ভাষাই যে শুধুমাত্র আমাদের হাসির কারণ ছিল, তা নয়। বাঁধাধরা গেরিলাদের প্রায় সব গুণই পেশমারগা পূর্ণ করেছিল। তারা আশ্চর্যজনক চিত্তাকর্ষক পুরুষ ছিল, কিন্তু সেই সাথে হাস্যকরও। তারা খাবারের বড় বোঝা নিয়ে মাইলের পর মাইল মার্চ করত। সংগ্রাম, ভূমি এসব নিয়ে সবচেয়ে হতবুদ্ধিকর মন্তব্য করত। তারা অস্ত্র পরিষ্কারের ঝামেলা খুব কমই করত, যেটা তাদের মাথার স্কার্ফ দিয়ে মুড়ানো থাকত। অনিয়মিত যোদ্ধাদেরকে যাচ্ছেতাই ভাবে ব্যবহার করত। সম্ভবত এসব আমাদের অতিরিক্ত আনন্দ দিয়েছিল।

এক পেশমারগাকে নিয়ে আমরা বেশ খোলাখুলি হাসাহাসি করেছিলাম। বিশাল বপুর এক লোক, যার মুখে ছিল ঝুলে পড়া ইয়া লম্বা এক মোঁচ, তার বিশাল হাতখানা মোড়ানো ছিল বেশকিছু ম্যাগাজিন দিয়ে, একটা হালকা মেশিনগান, একটা একে-৪৭ এবং একটা লম্বা বেয়নেটে সজ্জিত ছিল সে। এ ছাড়া পেশমারগারা খুব অতিথিপরায়ণ এবং খোলামনের মানুষ। তারা আমাদের প্রতি আগ্রহী ছিল, খুশি ছিল যে, এতদূর থেকে ছাত্ররা আসছে এবং তাদের সংগ্রামে অংশ নিচ্ছে; কিন্তু আমাদের

জীবন তাদের কাছে খুব রহস্যময় ছিল। শান্তিপূর্ণ সময়ে বেশিরভাগ পেশমারগারা ছিল কৃষক অথবা শ্রমিক। নিজেদের গ্রামের বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে তাদের খুব কমই ধারণা ছিল; বিদেশ তো বহুদূরের কথা।

সমভূমিতে অবস্থিত ইরাকি বাহিনী থেকে দূরে পাহাড়ের পাদদেশের লম্বা রাস্তার দক্ষিণ-পশ্চিমে ফিরইয়াদ আমাদের বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল। আমাদের কোনো ম্যাপ ছিল না, আর যেহেতু সাদ্দাম স্থানীয় মানচিত্র অংকন নিষেধ করেছিল, তাই আমাদের কাছে কিছুই ছিল না। যার কারণে আইয়ান এবং আমার কোনো ধারণাই ছিল না যে আমরা কোথায় ছিলাম। কিছু টার্গেট প্র্যাক্টিস, মার্শাল আর্টের কিছু কৌশল, আর কেডিপি'র সিনিয়র কমান্ডারদের সামনে প্যারেড—এই ছিল আমাদের গরম থাকার মতো কিছু কাজ। অ্যাকশনের ঘাটতি আমাদের তেমন বিরক্ত করছিল না; কেবল ইরাকে থাকা, ভোরবেলা দই এবং রুটির প্রাতঃরাশের জন্য জাগ্রত হওয়া, ভাঙা ভাঙা কুর্দি শেখার চেষ্টা, আমাদের চারপাশের অস্ত্রগুলোর নিয়মিত উপস্থিতি, প্রবীণদের যুদ্ধের গল্প আর ফোর্সড মার্চ, এয়ার রেইড, ফটোগ্রাফ আর নোট—আমি আশা করেছিলাম আমার সাংবাদিক হওয়ার জন্য এসব কোনো না কোনোভাবে যথেষ্টই ছিল। বেশিরভাগ লোকই কমপক্ষে একবার হলেও আহত হয়েছিল।

একদিন সন্ধ্যায় মুস্তফা নামে একজন লম্বা, চশমা পরা, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ—যে কিনা মধ্যমপর্যায়ের একজন রাজনৈতিক কর্মকর্তা ছিল—তাকে আমরা 'দ্য কমিসার' বলতাম। সে আমাদেরকে তার শরীরের কিছু ক্ষত দেখিয়েছিল। তার পেট ও পিঠে প্রায় এক হাত লম্বা মতো একটা তীক্ষ্ণ ক্ষত ছিল, যা কয়েক বছর পূর্বে দুটো বুলেটের আঘাতে সৃষ্টি হয়েছিল। আইয়ান বা আমার যুদ্ধে রক্তাক্ত হওয়ার কোনো ইচ্ছাই ছিল না।

জুলাই গড়িয়ে যখন আগস্টের দিকে মোড় নিল, সেই সময়টায় আমরা লেসার জাব নদীতে পৌঁছলাম। বেলা পড়ে এসেছিল, উত্তপ্ত ধূলিকণা ঝরে পড়ছিল। লোকজন, ট্রাক ও জিনিসপত্র নিয়ে আমরা একটা দৈত্যাকার ভেলায় করে নদী পার হলাম। শতাব্দী ধরে যুদ্ধ ও পশুচারণের কারণে বাদামী ঝোপঝাড়ের পাহাড় উত্তরের আকাশসীমার সাথে মিশে গেছে। দক্ষিণে ডোকান লেকের সমতল বিস্তৃতি গ্রীষ্মের রোদে মাছের আঁশের মতো আলোকিত হয়েছিল। নোংরা একটা রাস্তা তীক্ষ্ণ এক পাহাড় চূড়ার চারপাশে কুণ্ডুলি পাকিয়ে আছে। কয়েক বর্গমাইলের বাইরে একটা মালভূমি পর্যন্ত সেটা ছড়িয়ে আছে। মালভূমি প্রায় পুরোটাই ছিল ধ্বংসস্তূপে আবৃত। গত বছর ইরাকি বাহিনী তিন সপ্তাহের লম্বা একটা অভিযান চালায় ক্বালা ডিযা'র অবশিষ্টাংশে। সত্তর হাজার লোকের শহর পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল সেই অভিযানে। শহরের দিকে মোড় নেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু ফিরইয়াদ আমাদের দেখাতে চাচ্ছিল যে, সেখানে ঠিক কী কী ঘটেছে। বিগত কয়েক বছর ধরে কুর্দিদের উপর যেসব সহিংসতা চালানো হয়েছে, সে সম্পর্কে তার মুখ থেকে বেশ

কিছু জানতে পেরেছিলাম আমরা এবং বাস্তবে তাদের সাথে কী ঘটেছিল তার অল্প কিছু ধারণাও আমার হয়ে গিয়েছিল।

তবুও ক্বালা ডিজার দৃশ্যটি ছিল শান্তিময়। ধূসর ধ্বংসস্তূপের মাঝে শিশুরা দৌঁড়াচ্ছে, খেলা করছে; অফ ডিউটিতে থাকা পেশমারগারা হাতভর্তি তরমুজ আর কাঁধে একে-৪৭ নিয়ে হাঁটছে। মহিলারা মাথায় সাদা স্কার্ফ ও ট্র্যাডিশনাল কুর্দি উজ্জ্বল লাল পোশাক পরে উন্মুক্ত আগুনে রান্না করছে। সমতলে আড়াআড়িভাবে পড়ে থাকা একটা বিশাল কংক্রিটের ফলকে কেউ একজন 'কেন' শব্দটা এঁকেছিল। ইরাকি সেনারা গাছ ওঠার জায়গা ছেড়ে গিয়েছিল; জঞ্জালের গাঁদা আর জং ধরা রডের মধ্য হতে কিছু পপলার আর সিডার রোজ জন্মেছে।

দুটো ছাদ দিয়ে কোণাকুণি তৈরি হওয়া একটা বদ্ধ জায়গায় ক্বালা ডিজার ফার্মাসিস্ট তার অস্থায়ী ক্লিনিক বানিয়ে নিয়েছিল, তার প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম এক কোণায় রেখে মাটিতে রেখেছিল একটা পাতলা ম্যাট্রেস। ক্বালা ডিজায় কোনো পয়ঃনিষ্কাশন-ব্যবস্থা ছিল না, ছিল মাত্র একটা কূপ। অনিবার্যভাবে, গ্যাস্ট্রো-এন্টেরিক ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষ করে তরুণদের মাঝে। হাফ হাতা সাদা শার্ট আর ঢোলা পায়জামা পরা ফার্মাসিস্ট কলেরার আশংকায় চিন্তিত ছিল। সে কোনোরকমে একটা ক্ষয়ে যাওয়া স্ট্যান্ড যোগাড় করে নিয়েছিল শিরায় স্যালাইন সঞ্চলনের জন্য; যদিও তার সাথে প্রয়োজনীয় বোতল, টিউব বা সলিউশন কিছুই ছিল না। কাছেই একটি মেয়ে পাথরের স্তূপের কাছ থেকে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করছিল। এক সময় তার দোতলা ঘর ছিল ওটা। আমি যখন তার ছবি তুললাম, একটা হাসি দিল সে।

কিছুদিন পর আমরা হালাবজা'র পূর্বদিকের একটা শহরে গেলাম, যেখানে তিন বছর আগে রাসায়নিক অস্ত্রের আক্রমণে পাঁচ হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল। চার মাস পর গ্যাসের কারণে শহরটি পুরোপুরি মাটির সাথে মিশে যায়। আমাকে আর আইয়ানকে দেখতে পেয়ে এক ঝাঁক ধূলিমলিন, জীর্ণ শিশু আমাদের ট্রাকটিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। যদিও আমরা তখন সশস্ত্র অবস্থায় ছিলাম। একজন বৃদ্ধ মুখে শুকনো হাসি নিয়ে আমাকে তখন বলেছিলেন, "তোমাদের মানুষের কাছে আমাদের কথা বলো; বলো যে এখানে কী হয়েছিল।" পরে আমি এটা নিয়ে একটা স্টোরি ডেইলি মেইলকে দিয়েছিলাম, কিন্তু বিশেষ কারণে তারা সেটা প্রকাশ করেনি। তবে স্থানীয় পত্রিকায় সেটা প্রকাশ করা হয়েছিল আর এজন্য তাদের তরফ থেকে আমি পেয়েছিলাম ৫০ পাউন্ড ক্যাশ।

*****

আমাদের ইউনিট যখন ক্বালা ডিজার কাছাকাছি ছিল, তখন পঞ্চাশ মাইল দূরের সোলায়মানিয়ায় আবারও তীব্র লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। মার্চের শেষ আর এপ্রিলের

শুরু, এই মাঝামাঝি সময়ে পেশমারগারা শহরটি মোটামুটি দখলে নিয়ে ফেলেছিল। বেশ কয়েক দিনের লড়াই শেষে সাদ্দামের বাহিনীর থেকে শহরটার পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ তারা ছিনিয়ে নেয় আবারও। আমরা যখন সেখানে পৌঁছি, অবিশ্রাম গান ফায়ার চলছিল; যদিও মূল যুদ্ধ শেষ। প্রথমে আমরা বারো এবং ত্রিশজনের দুটো দল হিসেবে আলাদা হয়ে যাই। আমাদের অস্ত্রগুলো একটা পার্কে রেখে আসি। কাছের একটা বাড়ি থেকে ব্যাট-বল নিয়ে আসি। জঞ্জালের মাঝে বেখাপ্পাভাবে থাকা দুটো কংক্রিটের খণ্ডকে টেবিল বানিয়ে তাৎক্ষণিক একটা টেবিল টেনিস ম্যাচ শুরু করে দিই। এক মাইল বা তারও দূরে তীব্র বিস্ফোরণের একটা শব্দ আমাদের কানে আসে। তখন বুঝতে না পারলেও এখন আমাদের বুঝে আসে যে, কেন আমাদের সত্যিকারের যুদ্ধ থেকে দূরে রাখা হয়েছিল। প্রথমত, চলমান বেশিরভাগ যুদ্ধই কেডিপি'র প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী প্যাট্রিয়টিক ইউনিয়ন অব কুর্দিস্তানের পেশমারগারাই করছিল। তখন পর্যন্ত আমি তাদের মধ্যকার প্রতিযোগিতা সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। দ্বিতীয়ত, আমাদেরকে শুধুমাত্র মোবাইল পেশমারগা প্রোপাগাণ্ডা ইউনিট হিসেবে ব্যবহারে পরিষ্কার নির্দেশনা দিয়েছিল ফিরইয়াদ। এতে করেই পরিষ্কার হয়, কেন আমাদের এতগুলো ভিন্ন ভিন্ন ফ্রন্টলাইন ও ট্রুপ্সের সাথে দেখা দেখা হয়েছে। তার কাজ হলো যোদ্ধাদের কাছে আমাদের কিছুটা বিশ্বাসযোগ্যতা তুলে ধরা। তাই সে কিছুটা হলেও আমাদেরকে বিপদের মুখোমুখি করছিল, কিন্তু তার কাজ ছিল মূলত আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখা। তৃতীয়ত, একটা বিষয় সবার কাছে খুব ভালো করে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, আমরা যদি কোনোভাবে সত্যিকার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ি, তাহলে দায়বদ্ধ হয়ে যাব। সোলায়মানিয়াতে প্রথম সন্ধ্যায় সবাই যখন ড্রিংক করছিল, আমি তাদের ছেড়ে উঠে যাই। একটা নির্জন কোণা খুঁজছিলাম বমি করার জন্য। রাস্তায় টলছিলাম, একটা প্রাচীরের দিকে ঝুঁকেছিলাম বেশ অনেকখানি। তখন কানে এল কেউ একজন গুলি করা শুরু করেছে। সেই সাথে পুরো শহরের বন্দুকধারীরাও একযোগে ফায়ারিং শুরু করেছে মনে হলো। গাঢ় অন্ধকার; পুরো ইউনিট, আয়ান, অস্ত্রশস্ত্র সব কয়েকশো গজ দূরে ছিল। গোলাগুলি চলছিল; অবচেতনে উরুতে হাত রেখে ফুটপাতের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছিলাম। চাচ্ছিলাম সবাই চলে যাক আর আমি শান্তিতে বমি করে পাকস্থলি খালি করি। উদ্ভট একটা পরিস্থিতিতে আমরা অস্ত্রগুলো ব্যবহার করেছিলাম। ফুল অটোমেটিক কালাশনিকভের শব্দে বেশ কয়েকদিন আমাদের কানের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। গোলাগুলির সময় অস্ত্র রিলোড করার চিন্তা, ঘেমে যাওয়া হাতে নতুন ক্লিপের জন্য হাতড়ানো, সত্যি ভয়ানক!

একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, আমি আর আইয়ান এই পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ বেমানান। আমাদের পরিবার-পরিবেশ কোনোকিছুই আমাদেরকে স্বভাবজাত সামরিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য তৈরি করেনি।

আমাদের মতে, আমরা দুজন একসাথে ভালো একটা টিম। কৌতূহল, উত্তেজনা, তেজস্বিতা ও হাস্যরসে ভরপুর দুজন মানুষ। যথেষ্ট পরিপক্কও ছিলাম। আমরা এখানে যে ভূমিকায় আছি তা যে কতটা কৃত্রিম, সেটা ভালোভাবেই বুঝতে পারছিলাম।

কুর্দিদের চূড়ান্তভাবে সোলায়মানিয়া দখলের ঘটনা যুদ্ধের গতিকে পাল্টে দিয়েছিল। এই বিজয় ইরাকিদের অনেকটা রক্ষণাত্মক অবস্থায় ঠেলে দেয়। বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে পেশমারগা ও সাদ্দাম বাহিনী একে অন্যের সাথে যুদ্ধ এড়িয়ে চলছিল; খানিকটা অংশীদারত্বের ভিত্তিতে। ফলে, পুরো কুর্দিস্তানজুড়ে স্থানীয় কমান্ডারদের মাঝে যে সাময়িক যুদ্ধ-বিরতি হয়েছিল, তা ভেঙে যেতে শুরু করে।

শহরের কাছাকাছি একটা রাস্তা ধরে চলছিল আমাদের গাড়ি। হঠাৎ বিশাল এক ইরাকি সাঁজোয়া বাহিনীর সামনে ধরা পড়ে যাই। পথের মাঝে এক পিকআপ-ভর্তি পেশমারগা দেখে সৈনিকরা এতই হতবাক হয়ে যায় যে, তারা কিছুই করেনি আমাদের। বিনা ক্ষতিতে আমরা সেখান থেকে পালিয়ে গেলাম; তবে এর কাছাকাছি যে চেকপয়েন্টটা ছিল, সেখানে আমাদের বেশ সমস্যায় পড়তে হয়। এর আগে এখান থেকে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই পার হয়েছিলাম। আমাদের ছাড়িয়ে নিতে ফিরইয়াদ ও তার সঙ্গীদের বেশ ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হচ্ছিল। একপর্যায়ে কিছুক্ষণের জন্য মনে হচ্ছিল ওরা আর পারবে না। হঠাৎ করেই আমরা বেশ কঠিনভাবে সতর্ক হয়ে গেলাম। আমাদের ইরাকি পাসপোর্ট ছিল না। পরিস্থিতি যদি খারাপের দিকে যায় তাহলে কী হতে পারে সে ব্যাপারেও চিন্তা এল।

আমি আর আইয়ান একমত হলাম যে, আমাদের ঘরে ফেরার সময় হয়ে এসেছে। নিজেদের অপহরণ আমাদের পরিকল্পনার অংশ ছিল না; কিন্তু ব্যাপারটা সেরকমই হচ্ছিল। আমরা 'যাকো' শহরের সীমান্তে ছিলাম। তখন সাতটা বাজে। একটা দোকানের বাইরে বসে কিছু লোকের সাথে কথা বলছিলাম আর তুর্কি ফিরে যাওয়ার অপেক্ষা করছিলাম। তারা জানাল, তাদের এক বন্ধু সীমান্ত পেরিয়ে ইস্তাম্বুলের মাঝপথে আছে। সে আমাদের কয়েক ঘন্টার জন্য লিফট দিতে পারে। ঘটনা বুঝে ওঠার পর পুরো বিষয়টা কেমন নোংরা লাগছিল। সন্ধ্যার পর এই সময়টাতে উত্তর ইরাকে কোনো মানুষ কোথাও গাড়ি নিয়ে বের হয় না, খুব অল্পসংখ্যক বর্ডার অতিক্রম করে তুর্কিতে ঢুকে। কিন্তু আমরা ছিলাম ছাত্র আর ফ্রি রাইডের প্রস্তাবটা আমাদের কাছে খুব লোভনীয় ছিল। আমরা তাই গরম হয়ে যাওয়া কোক খেতে খেতে অপেক্ষা করছিলাম। এক ঘন্টা পর কিছু লোক এসে আমাদেরকে কাছের একটা হোটেলে খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানাল, আমরা ভদ্রভাবে মানা করে দিলাম। তারা জোর করতে লাগল, কিন্তু আমরা না বলাতেই স্থির ছিলাম। তারা খুব ভদ্রভাবে আমাদেরকে তাদের চটকদার হ্যান্ডগানগুলো দেখাল। উত্তর ইরাকে দেখা অস্ত্রগুলোর চেয়ে এগুলো ছিল একেবারেই আলাদা। আমাদেরকে একটা কালো মার্সিডিজে ওঠার

কঠিন ইঙ্গিত দেওয়া হল। এর চেয়ে ভালো কোনো বিকল্প আমাদের সামনে তখন ছিল না। আমরা গাড়ির ভেতর ঢুকলাম। যাকোর উপকূলে একটা হোটেল রুমে রাখা হলো আমাদের। বাইরে তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। ঘন তারের গ্রীলের জানালা দিয়ে শহরের আলো দেখতে পাচ্ছিলাম। খুব ভয়ের মাঝে ছিলাম সেই সময়টায়। সেই লোকটা কিছুক্ষণ পরপরই আমাদের দেখে যেত। সেই সাথে তার অস্ত্রগুলো দেখাতেও ভুল করত না। মাতাল ছিল, বারবার মদ খাচ্ছিল; আর প্রতিবার যখন আমাদের দেখতে আসছিল, আগেরবারের চেয়ে বেশি মাতাল দেখাচ্ছিল। মাঝরাতের দিকে একটা লোক মাতাল অবস্থায় রুমের দরজা না লাগিয়েই চলে যায়।

সাবধানে দরজা খুলে আমরা একটা লম্বা, সরু করিডোরে পা রাখলাম। খোলা একটা সাইড ডোর দেখতে পেলাম, সেটা দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। পাইনের সারির আড়ালে আস্তে আস্তে হেঁটে হোটেলের পেছন দিকে চলে আসি। এরপর মাথা নিচু করে সোজা ব্রীজের ঢাল বরাবর দৌঁড়ানো শুরু করি। আমাদের পালানোটা দ্রুতই তাদের নজরে আসে। খেয়াল করলাম, একটা গাড়ি রাস্তায় আমাদের ট্রেস করছে। আরও একবার খোলা জায়গায় ধরা পড়ার মুহূর্তে আমরা কালো রঙ-এর মার্সিডিজটা দেখতে পেলাম। আমরা এক রাস্তা থেকে অন্য রাস্তা, আবার ঘুরে আরেক রাস্তায় দৌঁড়াচ্ছিলাম। এরপর আমরা দেখলাম যে, গাড়িটার হেডলাইট আমাদের সামনের দেয়ালে আছড়ে পড়ল। আমরা রাস্তার দ্বারপ্রান্তে নিজেদের গা মিশিয়ে রাখলাম। লাইটগুলো ঝাঁকুনি দিয়ে আমাদের পাশ কেটে গেল, তারপর আবার চলতে শুরু করল। আমরা অন্য আরেকটা গলিতে মাথা নিচু করে আমাদের সামনে হেডলাইটের দোল খাওয়া আলো খুঁজছিলাম। কিছুক্ষণ এভাবে চলল। রাস্তায় আর কাউকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না আমার। আমি কোনো ভয় মনে করতে পারছিলাম না। অনুভূতির সাথে প্রচুর পরিমাণ এড্রেনালিন যুক্ত হয়ে মার্সিডিজটাকে এড়িয়ে চলার তীব্র জেদ মাথায় চেপে বসেছিল। পুরো পরিস্থিতিটা একই সাথে হাস্যকর, সিনেম্যাটিক; এমনকি যেকোনোভাবে বিপজ্জনকও হতে পারত। অবশেষে দুর্দান্ত নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে একটা কানা গলির বিপরীত দিকের দেয়ালে হেডলাইটের আলোয় আটকা পড়ি। পালানোর মতো কোনো জায়গা ছিল না; কিন্তু সেই মুহূর্তে যে গাড়িটা দেখলাম, সেটা মার্সিডিজ ছিল না। ওটা ছিল একটা ল্যান্ডক্রুজার, যেটাতে ছিল পেশমারগারা।

*****

এই পর্যন্ত কুর্দিদের ওপর আমার তেমন একটা আস্থা ছিল না। তাদের ধর্মটাও আমার কাছে পরিষ্কার ছিল না। তাদের বিশ্বাস গভীর হলেও সেটা ছিল সহনশীল ও মধ্যমপন্থার এবং এর নিদর্শন খুব কমই স্পষ্ট ছিল। এই কম স্পষ্ট নিদর্শনগুলোও

গেরিলাদের স্লোগান, তাদের জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবী বক্তৃতাগুলোর কারণে ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যেত। আমি জিজ্ঞাসা করলে আবার সমস্ত কুর্দিরা গর্বের সাথে বলত যে, তারা মুসলমান। গ্রামাঞ্চলের বেশিরভাগ কুর্দিদের গলায় দেখা যেত তাবিজ। প্রায়ই তাদের ইনশাআল্লাহ কথাটা বলতে শুনতাম। এটা কোনো সাধারণ অদৃষ্টবাদীর ব্যাপার না; বরং এটা একটা সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ, যাতে ধর্মের প্রভাব প্রচণ্ড। তাদের ধর্মকে আমি তেমন খেয়াল করিনি। আমি মুসলিমদের যেভাবে কল্পনা করেছিলাম, আমার কাছে কুর্দিদের তেমন মনে হতো না। তারা ফ্যানাটিক ছিল না, বেশ খোলামেলা আর মিশুকপ্রকৃতির। তারা শিক্ষিত ছিল আর দুনিয়া বুঝত। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমার যা ছিল তা-ই তাদের মাঝে দেখতে পেয়েছি। ফলে অনেকটা অসচেতনভাবে আমি সিদ্ধান্তে আসি যে, তারা মোটেও মুসলিম না।

ইরাকের এই গ্রীষ্মের পর থেকে আমি বহু বছর ধরে মরক্কো থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে চীন, উজবেকিস্তান থেকে মালয়েশিয়ায় ইসলামি-বিশ্বে ভ্রমণ, জীবনযাপন এবং কাজ করে কাটিয়েছি। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে, কুর্দিস্তানের এই ভ্রমণ বিশাল এক শিক্ষাপদ্ধতির, অন্যরকম এক অধ্যায়ের সূচনা ছিল। এ থেকে আমি জানতে পারলাম যে, 'ইসলামিক ওয়ার্ল্ড' টার্মটাকে ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক ও বর্ণবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, সেটাকে তারা প্রত্যাখ্যান করে। এই টার্ম দ্বারা শুধু এটাই বোঝায় না যে, মুসলিম নামক একটা গোষ্ঠী—যারা কিনা একটা রহস্যময় ও প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মের অনুসরণে জীবন কাটায়, বরং এটা একটা বিশাল, বৈচিত্র্যময় ও গতিশীল আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার সমষ্টি। অভিজ্ঞতা থেকে এই শিক্ষাও আমার হয় যে, নিজস্ব ধারণা ছাড়াও সর্বসাধারণের ধারণার প্রতিও সচেতন থাকতে হবে।

যাদের সাথে মেশার সুযোগ হয়েছে, তাদের মাঝে কিছু মুসলিম বাস্তবিকই বিশ্বাস করে যে, মুসলিমদের পবিত্র গ্রন্থ *কুরআন* সমাজের জন্য প্রকৃত ও খাঁটি ব্লুপ্রিন্ট, যা বিশ্ববাসীর অনুধাবন করা প্রয়োজন। আবার অনেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর শিক্ষাকে ভালোবাসে ও প্রশংসা করে, কিন্তু আধুনিক-বিশ্বে এর প্রয়োগের অসম্ভবতাও তারা বুঝতে পারে। কিছু আছে, যাদের মাঝে প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব আছে, তারাও ইসলামের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে গর্ববোধ করে। কিছু আছে, যারা পাঁচটা মৌলিক কাজের সবগুলো পালন করে, যা তেরোশো বছর পূর্বে শুরু হওয়া বিশ্বাসের মূল স্তম্ভ। দৈনিক পাঁচবার নামাজ পড়া, মক্কায় হজপালন, জাকাতপ্রদান, পবিত্র মাস রমজানে রোজা রাখা এবং 'আল্লাহ ছাড়া অন্যকোনো প্রভু নেই আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রেরিত পুরুষ'—এই স্বীকারোক্তিপ্রদান, এই হলো সেসব স্তম্ভ, যার ভিত্তিতে একজন মানুষকে মুসলিম হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। কিছু মানুষ এখনো চায়, বিশ্বজুড়ে ইসলামের সম্প্রসারণ ঘটুক। মুসলিমদের বিশাল একটা অংশ তাদের সমাজ-সংস্কৃতির ওপর

পশ্চিমা আগ্রাসন এবং যুদ্ধংদেহী মনোভাবের প্রভাব নিয়ে চিন্তিত ও রক্ষণশীল। আবার সমান অনুপাতের বিশাল একটা অংশ—বলতে গেলে একই মানুষগুলো—আবার পশ্চিম দ্বারা অনুপ্রাণিত ও আকৃষ্ট। কিছু ছিল সহিংসতার প্রতি আকৃষ্ট। আস্তে আস্তে আমি বুঝতে পারলাম যে, ইসলাম একটা লেবেল, যা অনেক কিছুতে প্রয়োগ করা যেতে পারে, যার কোনোটিরই পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা দেওয়া যাবে না।

১৯৯০ সালের দিকে বিশ্বব্যাপী ইসলামের ধীরগতিতে উত্থান শুরু হলো। দশকের শুরুতে, কমিউনিজমের পতনের পর জাতীয়তাবাদ ও জাতিগত পরিচয়ের যে প্রশ্ন উঠেছিল, তা বিশেষ করে বলকান এবং পূর্ববর্তী সোভিয়েত রাষ্ট্রে বিতর্কে বেশ প্রাধান্য পেয়েছিল। এ ছাড়াও যুদ্ধ-পরবর্তী হস্তক্ষেপ, শান্তিরক্ষা, জাতি গঠন এবং এরকম আরও অনেক ইস্যু নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে, স্বতন্ত্র ও সমষ্টিগতভাবে তর্ক-বিতর্ক চলছিল। নতুন স্নায়ুযুদ্ধপরবর্তী জীবনব্যবস্থায় কাঠামোগত, প্রভাবিত ও জীবনধারনের উপায় অনুসন্ধান চলছিল। পলিটিক্যাল সাইন্টিস্টরা ইতিহাসের পরিসমাপ্তির কথা বলতেন, যা কিনা বিবিধ ঘটনার সমাপ্তিকে বোঝায় না; বরং এর মাধ্যমে তারা আমেরিকা বা পশ্চিমামুক্ত গণতন্ত্রের বিজয় ও এর থেকে উদ্ভূত সমাজকে বুঝিয়েছেন। বিশ্বায়নের ধাক্কা এবং মুক্তবাজার-স্বীকৃত আন্তঃসংযোগ ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে অগ্রগতি দেখে মনে হচ্ছিল যে, পশ্চিমারা তাদের ধ্যান-ধারণার সমষ্টি, অর্থনৈতিক তত্ত্বসমূহ, নীতি ও নৈতিকতার আদর্শ, সংস্কৃতি—যা দ্বারা তাদের নিজেদের সংজ্ঞায়িত করে, তারই আধিপত্য পৃথিবীর বুকে নিশ্চিত হতে চলেছে।

তবুও দশকের শেষের দিকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এমন অনেক লোক ছিলেন, যারা আধুনিকতার এই সংস্করণ এবং 'অগ্রগতি'র আধিপত্য সম্পর্কে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। কেউ কেউ এটাকে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ প্রক্রিয়ার বৃদ্ধি হিসেবে দেখছিলেন, যা গত কয়েক শতাব্দী ধরে চলছে। অনেকে আবার আশা করেছিলেন যে, এমন একটা বিকল্প কিছু সৃষ্টি হবে, যা তাদের আগ্রহ, সমাজ, সংস্কৃতির সাথে ভালোভাবে খাপ খাবে। আরও ছিল বিশ্বায়ন-বিরোধী আন্দোলন এবং ধর্ম সেটাকে গভীর সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শিকড় দিয়ে প্রলম্বিত করেছিল। সহস্রাব্দের নতুন সূর্য দেখেছে ধর্মীয় মৌলবাদের পুনরুত্থান; দেখেছে সত্য, ন্যায়, খোদায়ী-পদ্ধতিতে সমাজ-গঠনের সেই বিশ্বাস, যার ভিত্তি হলো পবিত্র বাক্যসমূহের কঠিন ও আক্ষরিক বাস্তবায়ন। হিন্দু মৌলবাদীরা ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করছিল; কয়েক যুগ ধরে আমেরিকার খ্রিস্টান অংশটা বেশ প্রভাবশালী ছিল। উগ্র ইহুদি মৌলবাদীরা ইসরায়েলের ওপর তাদের ক্ষমতার দখল নিচ্ছিল; সংখ্যায় তারা কম ছিল, তবে বর্ধনশীল। অতঃপর ৯/১১-এর আক্রমণ ইসলামি মৌলবাদীদেরকে এক ভয়াবহ ও দর্শনীয় উপায়ে বিশ্ববাসীর নজরে নিয়ে আসে; যারা কিনা আঞ্চলিক পর্যায়ে ত্রিশ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে প্রধান খেলোয়াড়ের ভূমিকায় ছিল। তখন থেকে সাধারণভাবে ইসলাম সম্পর্কে ও বিশেষকরে ইসলামি জঙ্গিবাদ নিয়ে